ATHENA, VOLUME IX, JULY 2025 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 170–180
www.athenajournalcbm.in

বাউল সংগীতের আড়ালে থাকা তত্ত্বের খোঁজ: একটি দর্শনগত অনুসন্ধান

ড. তাপস দাস*

প্রাপ্ত: ২৫.০২.২০২৫ পরিমার্জন: ৩০.০৪.২০২৫ গৃহীত: ০৮.০৬.২০২৫

সারসংক্ষেপ: *দর্শনগত চর্চায় বাউলিয়া তত্ত্ব পর্যালোচনা এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। উল্লেখ্য, বাউল প্রসঙ্গে যে তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা পাই তার সিংহভাগটাই হলো সাহিত্যধর্মী আলোচনা। ফলত এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক, বাউলিয়া তত্ত্বালোচনা আদতে সাহিত্যধর্মী চর্চা। কিন্তু বাউল গানের মর্মার্থ বিচারে এটা উপলব্ধি হয় যে, এই গানের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সাহিত্যের বিচার্য বিষয় হলেও সাহিত্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে এই গানের মর্মার্থ উপলব্ধি সম্ভব নয়। বাউল গানের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হলে দর্শনের পরিসরে বাউল গানের চর্চা আবশ্যক। অর্থাৎ এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো, বাউলচর্চা বলতে কি কেবল সাহিত্যচর্চাকে স্বীকার করবো? না কি সাহিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করে বিশুদ্ধ দর্শনচর্চার আঙ্গিকেও বাউল মতের অর্ন্তভূক্তিকে গ্রহণ করবো? তা অনুসন্ধান করা। আর এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এখানে যে যে প্রশ্নগুলি উঠে এসেছে তা হলো—১. বাউল গান কী সত্যি দর্শন পদবাচ্য?, ২. বাউল গানের প্রসিদ্ধ রচয়িতা ফকির লালন সাঁইকে কী দার্শনিক বলে অভিহিত করা যায়?, ৩. তাঁর গানের ভাষায় যে সিদ্ধান্তের প্রকাশ আমরা পাই তাকে কী দর্শন বলা যায়?, ৪. যদি যায় তাহলে কেন? এবং তার পরিধি কী?, ৫. বাউল গানের আলোচনা কেন সাহিত্য মূলক আলোচনা বলে স্বীকৃত?, ৬. কাব্য ও দর্শনের মধ্যে সম্বন্ধ কীরূপ? বাউল গানে এই সমন্বয় কিভাবে ঘটেছে?, ইত্যাদি প্রশ্নগুলি উঠে এসেছে, যার উত্তর এই প্রবন্ধের আলোচনার মধ্যদিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ: *বাউল সংগীত, বাউল দর্শন, বাউল সাহিত্য, অধ্যাত্মবাদ, জড়বাদ, লৌকিক অধ্যাত্মবাদ।*

---

*সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়, উত্তর চব্বিশ পরগনা।
e-mail: tapassnim@gmail.com

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো ভারতীয় দর্শনের তত্ত্বালোচনায় বাউলের স্থান নির্ণয় করা। অর্থাৎ 'বাউল' কী কেবল গানের ভাষা? না কী ভারতীয় দর্শনের একটি ধারা? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা। তবে তার আগে বাউলের প্রাথমিক পরিচয় জানা আবশ্যক। কারণ, বাউল কি? তা না জেনে মূল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান কখনই সম্ভব নয়। ফলত এখন প্রশ্ন আসে—'বাউল' বলতে কি বোঝায়? উল্লেখ্য, 'বাউল' শব্দটির সাথে আমরা সকলেই কম-বেশী পরিচিত। 'বাউল' শব্দটি শুনলেই আমাদের প্রথমেই মনে আসে বাংলার এক বিশেষ ধারার লোকসংগীতের কথা কিংবা ঘরছাড়া কোনো উদাসী সাধকের কথা, যারা কিনা মহাজনী গানের সাথে একতারা বাজিয়ে মাধুকরী করে থাকেন। 'বাউল' বলতে প্রাথমিকভাবে এদেরকেই আমরা চিনি। এর চেয়ে বেশী যারা 'বাউল' সম্বন্ধে ওয়াকিবহল, তারা মনে করেন বাউল হলো দেহসর্বস্ববাদী এক সাধন সম্প্রদায়। এরা দেহসাধনার কথা বলেন। কিন্তু প্রকৃত বিচারে এগুলির কোনোটি বাউলের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নয়। ফলত প্রশ্ন আসে—তাহলে বাউল কে?

প্রশ্নটি দ্বিমাত্রিক, এর দ্বারা যেমন 'বাউল'-এর শব্দার্থগত অনুসন্ধানকে বোঝায়, তেমনি আবার সম্প্রদায়গতভাবে বাউল কারা? তাকেও বোঝায়। এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, কে প্রকৃত বাউল? অর্থাৎ বাউলের পরিচয় নিয়ে যেমন আলেম সমাজের মধ্যে কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই, তেমনি আবার 'বাউল' শব্দের অর্থ নিয়েও বিদ্বৎজনের মধ্যে এক অন্তহীন মতানৈক্য এখনও বর্তমান। এই বিভ্রান্তির মূল কারণ অবশ্য 'বাউল' পদের ব্যবহার। 'ব্যক্তি' বা 'অর্থ' কোনো ক্ষেত্রেই বাউল শব্দটি অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বাংলার সংস্কৃতিতে 'বাউল' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলস্বরূপ 'বাউল' পদের অর্থ নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা মতের উদ্ভব হয়েছে। তাই বাউল পদের অর্থ এবং কাদের বাউল বলব? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের 'বাউল' পদের প্রচলিত ব্যবহার পর্যালোচনা করতে হয়।

প্রসঙ্গত, বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে 'বাউল' শব্দের ব্যবহার অনুসন্ধানে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'বাতুল' পদটির কথা। কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির মতে 'বাতুল' পদ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি। আক্ষরিক অর্থে 'বাতুল' বলতে 'উন্মাদ' বোঝায়। তবে এই উন্মাদতা মানসিক বিকার জনিত নয়। বাউল হলেন ভাবের উন্মাদ বা প্রেমের উদাস। অর্থাৎ এই স্থলে 'উন্মাদ' বলতে 'মর্ম্মের উন্মাদতা'কে বোঝানো হয়েছে। মূলত, এই অর্থেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে 'মহাবাউল' পদের ব্যবহার[১]। তবে এমত সর্বজন সম্মত নয়। একদল গবেষকদের মতে উত্তর ভারতে একদল মানুষ আছে যাদের চিন্তা এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, প্রমাদযুক্ত; এই শ্রেণির ব্যক্তিবর্গকে 'বাউর' বলে অভিহিত করা হয়। এবং এদের সাথে 'বাউল' বলে অভিহিত ব্যক্তিবর্গের চরিত্রের সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করা যায় বলে, কারো কারো মতে 'বাউর' থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি। কেউবা আবার 'আউল' শব্দের পৌনঃপুনিক অপভ্রংশ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি বলে স্বীকার করেছেন। যদিও আরেক মতে সংস্কৃত শব্দ 'বায়ু' সাথে 'ল' শব্দটি সম্বন্ধযুক্ত হয়ে 'বাউল' বাউল পদের উৎপত্তি। এমতে যে সকল সাধক শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার সাধনার দ্বারা আত্মিক শক্তি লাভ করেছেন অথবা যারা বায়ু রোগগ্রস্থ উন্মাদ, তাদেরকেই 'বাউল' বলে। কাজেই 'বাউল' শব্দের উৎস আলোচনা থেকেই এটা স্পষ্ট, বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে 'বাউল' শব্দটি কখনোই অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ফলত 'বাউল' শব্দের অর্থ নিয়ে পণ্ডিত মহলে একটি মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। তবে এই মতভেদ কেবল 'বাউল' শব্দের অর্থ নির্ণয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; 'বাউল' কে? বা কাকে বলবো? এই নিয়েও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ আছে। উক্ত প্রশ্নে এখানে ৪ ধারার মতের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—

১. এক বিশেষ শ্রেণির সাধক
২. একটি বিশেষ ধর্মমত ও সাধন পদ্ধতি
৩. সংগীতের একটি স্বতন্ত্র ধারা
৪. উক্ত তিনটি ধারার মহাসমাগম।

আসলে স্থান-কাল-পাত্রভেদে যেহেতু 'বাউল' পদটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাই এরূপ অর্থের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তবে সমস্ত মতানৈক্য স্বীকার করেও মোটামুটি ভাবে এটা বলা যায়, জাত-বর্ণ-ধর্ম ভেদ তথা সকল প্রকার সামাজিক বেড়াজাল থেকে মুক্ত স্বাধীন সত্তা তথা আত্মভোলা ও ভাবে উন্মত্ত ব্যক্তিকে বাউল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যার না আছে পারিবারিক বাঁধা, কিংবা না আছে জাগতিক বিষয়-আশয়ে কোনো প্রকার মোহ। এদের সঙ্গী হলো সাধন সংগীত; আর সাথে আছে সাধন সঙ্গিনী। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সুফি সাহিত্যে বর্ণিত দেওয়ানার সাথে বাউলের সাদৃশ্য আছে। বাউলগণ যেমন মূর্তি পূজায় অবিশ্বাসী, তেমনি আসক্তি নেই কোনো ধর্মশাস্ত্রে। আসলে এরা দেলকিতাবের আজ্ঞাবাহী। তাছাড়া সম্প্রদায়গত ভাবে 'বাউল' নামটি গোষ্ঠীভুক্তের প্রত্যক্ষ সৃষ্টি নয়। বরং গোষ্ঠী বর্হিভূত পরোক্ষ আরোপিত। প্রকৃতপক্ষে বাউলদের মধ্যে সম্প্রদায়গত কোনো চেতনা বিরাজই করেনা। তারা আপন মর্ম্মের তারনায় হৃদয়ের দাবদাহন নিয়ে ঘুড়ে বেড়ায়। ছুটতে থাকে অজ্ঞাত অনামকের সন্ধানে। তাদের মর্ম্মে নিয়তই এই অনামক আনাগোনা করে, কিন্তু তাঁর প্রকৃত সত্তা সম্পর্কে সে অবগত হতে পারেনা। এই রহস্যময় অনামকের লুকোচুরির খেলায় বিস্মিত হয়ে আরশিনগরের পড়শির বর্ণনায় লালন সাঁইজি গান বাঁধেন—

'আমি একদিনও না দেখলাম তারে
আমার বাড়ি কাছে আরশিনগর
ও এক পড়শি বসত করে।'[২]

তবে আজ 'বাউল' শব্দটির তাৎপর্য আর 'ভাবে উন্মত্ত সাধকের' মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আজ 'বাউল' শব্দটি তার প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করে এক 'বর্গীয়' শব্দ হয়ে উঠেছে। আজ বাউল শব্দটি সাধনার গণ্ডী ছাড়িয়ে একটি পেশাবৃত্তির পরিচায়ক শব্দ হয়ে উঠেছে। অন্যান্য আর দশটি অর্থ উপার্জনকারী কর্মের ন্যায় আজ বাউলও পেশা। এই পেশায় কেউ গান গেয়ে মাধুকরী (ভিক্ষাবৃত্তি) করেন; কেউবা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে মাচায় বা খাঁচায় সংগীত পরিবেশন করেন। এ ধারার বাউলের সাথে মূল ধারার কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া এই গবেষণাপত্রে বাউল দর্শন বলতে যে দর্শনের কথা বলা হয়েছে তার সাথেও এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই গবেষণাপত্রে 'বাউল' শব্দটি আদি অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় দুদ্দু শাহের একপদ। বাউলের পরিচয় ব্যাখ্যায় পদকর্তা তাঁর একপদে বলেছেন—'যে খোঁজে মানুষে খুদা সেই তো বাউল', অর্থাৎ বাউল হলো এক সাধন পন্থা; যে সাধনায় দেহকে অবলম্বন করে দেহমধ্যস্থ পরমসত্তার সন্ধান করা হয়। মানুষের অন্তরে অবস্থিত মনের মানুষের সন্ধান করা হয়। কিন্তু আজ কালচক্রে তা হয়ে উঠেছে কেবল গান ও পেশাবৃত্তির এক মাধ্যম। বাউল বর্ণিত সহজ মানুষের সন্ধান সেখানে নেই; আছে কেবল বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার। তাই বাউল সাধনায় যে মনের মানুষের সন্ধান করা হয়েছে তার সন্ধান পেতে হলে আমাদের বাউলের আদিরূপে ফিরে যেতে হয়, বিচার করতে হয় গানের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী। কাজেই আদতে বাউল কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সেই ব্যক্তিকে বাউল বলে সম্বোধন করা যায় যে—

ক. সহজ সাধনায় বিশ্বাসী।
খ. যে দেহকে আশ্রয় করে দেহমাঝে পরমসত্তার সন্ধানী।
গ. দেহ সাধনায় যে চারচন্দ্রের সাধক।
ঘ. গুরুবাদের প্রতি যে একান্ত অনুগত।
ঙ. শাস্ত্রাচারের বদলে যে দেলকেতাবীর আজ্ঞা বাহক।

এখন প্রশ্ন—আধুনিক সমাজে বাউলের আদি রূপের সন্ধান লাভ কিভাবে সম্ভব? এর একটি সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে, যেখানে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বাউল সাধনা হয়; সেখানে সাধনার দ্বারা যদি এই সত্যের অনুসন্ধান করা যায় তাহলেই 'জ্যান্ত বাউল'-এর সাক্ষাৎ মেলে। যে কিনা 'মনের মানুষ'-এর সন্ধানে পাড়িদিয়েছে এই ভবসাগরে। আর এরূপ ব্যক্তির

সাধন সংগীতের মধ্যদিয়ে জগৎ ও জীবনকেন্দ্রিক যে তত্ত্বের প্রচার হয়ে থাকে তাকে বাউলিয়া তত্ত্ব বলে। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলি, আজ পর্যন্ত 'বাউল'কে কেন্দ্রকরে যে সকল তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা পাই তার সিংহভাগটাই হলো সাহিত্যধর্মী আলোচনা। মূলত সাহিত্যের পরিসরেই বাউলচর্চা প্রাধাণ্য পেয়েছে। ফলত প্রশ্ন আসে বাউল কী তাহলে সাহিত্যধর্মী চর্চা? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলি হ্যাঁ, একথা ঠিক যে সাহিত্যচর্চায় বাউল মতবাদ ও গান বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় একথা স্পষ্টভাবে উঠে আসে যে, বাউল মতবাদ সাহিত্যগত ভাবে অনেক উচ্চমার্গের সাহিত্য। তবে বাউল মতবাদের যে উৎকর্ষতা, তা যে কেবল সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, একথাও বলাই বাহুল্য। সাহিত্যের গণ্ডীকে অতিক্রম করে দর্শনগত চর্চায় বাউল মতবাদ সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাউলগণ তাদের গানের ভাষায় যে ভাবের অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে তা কেবল সাহিত্যচর্চার বিষয় নয়, এ হলো শুদ্ধ দর্শনগত সিদ্ধান্ত। আর তাই 'বাউল গান' দর্শন পদবাচ্য এবং 'বাউলগণ' দার্শনিক। এই প্রসঙ্গে 'দর্শন' শব্দটির অর্থও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাখ্যার দাবীদার।

প্রসঙ্গত 'দৃশ' ধাতুর সাথে 'অনট্' প্রত্যয়যোগে 'দর্শন' পদের উৎপত্তি। যার আক্ষরিক অর্থ 'দেখা' বা 'প্রত্যক্ষ' করা। তবে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রকে নিবিড়ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটা উপলব্ধি হয় যে, দর্শন শব্দের দ্বারা কেবল চাক্ষুস প্রত্যক্ষ নয়; অপরোক্ষ উপলব্ধি, শাস্ত্র জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনামূলক জ্ঞান— এ সকল প্রকার জ্ঞানই শাস্ত্রে 'দর্শন' পদবাচ্য। অর্থাৎ এখানে 'দৃশ' ধাতুর প্রয়োগ কেবল 'চোখে দেখা'র মধ্যে সীমিত নয়। চিন্তা, ধ্যান, শ্রবণ, মনন দ্বারা আমরা যা কিছু অর্জন করি সেই সকল প্রকার সত্য 'দর্শন' পদবাচ্য। এখন এই প্রেক্ষাপটে যদি বাউল গান, গান মধ্যস্থ রূপকের অর্থ ও তার প্রসিদ্ধ রচয়িতা স্বরূপ ফকির লালন সাঁইজির অবস্থান অনুসন্ধান করি, তাহলে বাউল গানকে অবশ্যই 'দর্শন' বলে স্বীকার করতে হয় এবং লালন সাঁইজিকে এই দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রচারক তথা দার্শনিক বলে দাবী করতে হয়। কারণ বাউলগণ তাদের সাধনার মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনকেন্দ্রিক যে সত্যকে সম্যক ভাবে উপলব্ধি করেছেন, গানের ভাষায় সহজ সুরে তাকেই সে বর্ণনা করেছেন। তবে এই গানের ভাষায় কেবল সত্যকে বর্ণনা করা হয়নি; সত্যের সাথে অসত্যের ভেদ এবং সত্যকে পাবার পথেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই বাউল গান কেবল সংগীত নয়, এ হলো বিশুদ্ধ দর্শনগত সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করার এক মাধ্যম। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় বাংলাদেশের স্বনামধন্য অধ্যাপিকা হাসনা বেগমের কথা। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বাউল গানের অর্থ বিচার করে এর দর্শনগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন যথা—জ্ঞানতাত্ত্বিক, নীতিতাত্ত্বিক এবং অধিবিদ্যাগত বৈশিষ্ট্য'[৩]। এখন প্রশ্ন আসে—বাউল সংগীতের ভাষায় এরূপ দর্শনগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ কিভাবে ঘটেছে?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বাউল গানের মর্মার্থ উপলব্ধি এবং তাৎপর্য বিচার একান্ত প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বাউল গান যে কেবল সাহিত্যচর্চার বিষয় নয় বরং এটা যে শুদ্ধ দর্শনগত সিদ্ধান্তকে সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করার এক পন্থা, তার প্রমাণ আমরা পাই বাউল গানের অর্থ বিশ্লেষণে। সিরাজ সাঁই, ফকির লালন সাঁই, হাছন রাজা, দুদ্দু শাহ, ফকির পাঞ্জু শাহ, যদুবিন্দু, পদ্মলোচন, কাঙাল হরিদাস প্রমুখ বাউল-ফকিরগণ তাদের গানের ভাষায় যে ভাবকে ব্যক্ত করেছেন তা আসলে শুদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্ত। তবে প্রথাগত দর্শনচর্চার সাথে এর পার্থক্য হলো, প্রথাগত দর্শনচর্চায় দার্শনিকগণ আপন সিদ্ধান্তকে কোনোরূপ ভনিতা না করে তত্ত্বাকারে প্রকাশ করেন। আর বিপরীতক্রমে বাউলগণ আপন সিদ্ধান্তকে অন্তর থেকে উৎসারিত সহজ সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফকির লালন সাঁইয়ের একটি গানকে এখানে আলোচনা করা যায়। সাঁইজি তাঁর এক গানে বলেছেন—

'আপনাকে আপনি যে জন জানে
আপন আত্মাকে সে দেখেছে নয়নে
সবে বলে আমি আমি, আমি কে তা কেউ না জানে।
ও মন আপনাকে যে চিনেছে, নিগুঢ়তত্ত্ব সেই পেয়েছে'[৪]

এখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন আসে—এই গানের মধ্য দিয়ে সাঁইজি কী বলতে চেয়েছেন? উত্তরে বলি, সকল জ্ঞানের মূলে যে 'আত্মজ্ঞান' তাই সাঁইজি বলেছেন এই গানের ভাষায়। একথা আমরা সকলেই দাবী করি যে, জ্ঞানান্বেষনের তৃষ্ণা ব্যক্তির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে আছে মানুষের এই কৌতূহলি মন। মানুষ অজানাকে জানতে চায়, অধরাকে ধরতে চায়। আর এই জ্ঞানান্বেষনের তৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে সে সৃষ্টি করেছে দর্শন শাস্ত্রের। দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার মধ্য দিয়ে মানুষের কৌতূহলী মন যে প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করেছে তা মূলত জগৎ ও জীবন বিষয়ক নিত্য কিছু প্রশ্ন, যেমন—জগৎ সৃষ্টির মূলে কী আছে? সৃষ্টির আদিরূপ কী? সৃষ্টিকর্তা কে? সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক কীরূপ? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। তবে সকল জ্ঞানের মূলে যে 'নিজেকে জানা' তা কিন্তু চিন্তাবিদগণ সর্বদাই বলেছেন তাদের আপন মতবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। যার ব্যতিক্রম লালন সাঁইয়ের চিন্তা-চেতনাতেও হয়নি। সক্রেটিসের ন্যায় লালন ফকিরও বারংবার 'নিজেকে জানা'-র কথা বলেছেন তাঁর গানের ভাষায়। সাঁইজির মতে মানুষ জগৎ বিষয়ক যত জ্ঞানই অর্জন করুক না কেন যতক্ষণ না তার আত্মদর্শন হচ্ছে, ততক্ষণ তার যথাযথ জ্ঞান লাভ অধরাই থেকে যাচ্ছে। আসলে এক্ষেত্রে লালন সাঁইজির দর্শনেও আমরা সাবেকী বা প্রথাগত দর্শন চেতনার একটা ছাপ পাই। প্রাচীন সাবেকী ভারতীয় দর্শনচর্চাতে এটা স্বীকার করা হয় যে, জীবের মুক্তির মূলে আছে 'আত্মদর্শন'। যুগ যুগ ধরে ঋষিমুণিগণ জগৎ ও জীবন কেন্দ্রিক যে সকল প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করছেন তন্মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো—আমি কে? আমার স্বরূপ কী? জীবের দুঃখের মূল কারণ কী? এবং কীভাবেই বা তা হতে মুক্তি লাভ সম্ভব? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন; যার উত্তরে সাবেকী দর্শনে দাবী করা হয়েছে—দুঃখের মূল কারণ হলো অবিদ্যা। অবিদ্যা বলতে এখানে মূলত বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না থাকাকেই স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ সাবেকী ভারতীয় দর্শন মতে জীবের দুঃখের মূল কারণ হলো অবিদ্যা, অবিদ্যা প্রসূত জীব বিষয়ের যথাযথ স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয় বলে সে দুঃখ ভোগ করে। তাই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে অবিদ্যার বিনাশ আবশ্যক। যদিও কি উপায় এই বিনাশ সম্ভব তা নিয়ে কিন্তু প্রথাগত দর্শনচিন্তায় কোনো মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায় না।

তবে অবিদ্যা প্রসূত জীবের যে এই অজ্ঞতা তা কিন্তু কেবল জগৎ বা বাহ্য বিষয় কেন্দ্রিক নয়। এই অজ্ঞতা তার 'স্বরূপ' উপলব্ধির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ অজ্ঞতা প্রসূত জীব যেহেতু আপন স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়; সেহেতু সে তার আত্মপরিচয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহল নয়। তাই আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান দর্শনের এক কেন্দ্রীয় চিন্তা, যে চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে উপনিষদ উল্লেখিত 'আত্মনং বিদ্ধি' বাক্যটির মধ্য দিয়ে। বাণীটির বাংলা তর্জমা হলো 'আত্মাকে জানো'। 'আত্মা' বলতে এখানে মুখ্যত 'জীবাত্মা'র কথা বলা হয়েছে। উপনিষদ অনুসারে জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মস্বরূপ জানতে পারে, ততক্ষণ তার মুক্তি সম্ভব নয়। যার জন্য যুগ যুগ ধরে ঋষিমুণিগণ শাস্ত্রাচারের মধ্যদিয়ে ব্যক্তিকে আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানী হবার উপদেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে উক্ত গানে লালন ফকিরও একই কথা দাবী করেছেন যে, সকল তত্ত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব হলো আত্মতত্ত্ব। আত্মতত্ত্বের জ্ঞান বিহীন কোনো জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান নয়। আসলে আমরা সবাই 'আমি' 'আমি' করি ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে 'আমি কে'? বা 'কী'? তা সম্বন্ধে আমরা কেউই জ্ঞাত নয়। যার জন্য উক্ত গানে সাঁইজি একদিকে যেমন আক্ষেপের সুরে বলেছেন—'সবে বলে আমি আমি, আমি কে তা কেউনা জানি'। তেমনি আবার আত্মানুসন্ধানীর উদ্দেশ্যে তাঁর উপদেশ স্বরূপ তিনি বলেছেন 'ও মন আপনাকে যে চিনেছে, নিগূঢ়তত্ত্ব সেই পেয়েছে'। তবে শুধুমাত্র এই একটি গানই নয়, বাউল গানের চর্চায় সাঁইজি রচিত এরকম অজস্র গানের উল্লেখ আমরা পাই যেখানে সাঁইজি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় আত্মদর্শনের কথা বলেছেন। তাছাড়া কেবল জীবের স্বরূপ অনুসন্ধান নয়; জগৎ বিষয়ক, সৃষ্টি বিষয়ক, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক বিষয়ক, বা জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সম্পর্ক, জীবের মুক্তি বা নির্বাণ, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি দর্শনগত তত্ত্বের আলোচনাও আমরা পাই বাউল গানে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুটিমনসুর রচিত 'কে বলে মানুষ মরে' গানটির কথা এখানে বলা যায়। উক্ত গানের একপদে কুটি মনসুর জীবন-মৃত্যু প্রসঙ্গে সংশয় প্রকাশ করে বলছেন—

'কে বলে মানুষ মরে,
আমি বুঝলাম না ব্যাপার!
ও মানুষ মরলে,
বিচার হবে কার?
আমি বুঝলাম না ব্যাপার'

দৈনন্দীন জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায়শই হয় যে, একজন ব্যক্তি পরোপকারী, সৎ, মিতভাষী হওয়া সত্বেও নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। বিপরীতক্রমে একজন ব্যক্তি অসৎ, নিষ্ঠুর, অসাধু হওয়া সত্বেও সুখে আছে। কিন্তু এমনটি তো হওয়ার কথা নয়। ব্যক্তিকে তো তার কর্ম অনুসারে ফলভোগ করতে হয়। যে ব্যক্তি ভালোকর্ম সম্পাদন করে তার তো ভালো ফলভোগ করার কথা, বিপরীতক্রমে যার দ্বারা মন্দ কর্ম সম্পাদিত হয় তার তো মন্দ ফলভোগ করার কথা। ফলে এই পর্যায় এই কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক এই বৈপরীত্যের কারণ কী? চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারা সিদ্ধ কোনো বিষয়ের দ্বারা এই বৈপরীত্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ফলত এর একটি সম্ভাব্য উত্তর স্বরূপ এটা বলা যায়, ব্যক্তি এই জন্মে ভালো কর্ম সম্পাদিত করলেও পূর্বজন্মে তার দ্বারা কোনো মন্দকর্ম সম্পাদিত হয়েছিল যার ফল ব্যক্তি সেই জন্মে ভোগ করেনি। কাজেই পূর্বজন্মে কৃত মন্দকর্মের ফলস্বরূপ, ব্যক্তি এই জন্মে সাধু হওয়া সত্বেও নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো— মৃত্যুতেই তো জীবের পরিসমাপ্তি, তাই পূর্বজন্মের ফল সে এই জন্মে ভোগ করছে, এরূপ কথার তাৎপর্য কী?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সাবেকী ভারতীয় দর্শনে জীবের স্বরূপ প্রসঙ্গে আলোচনায় জীবকে দেহ ও আত্মার সমন্বিত রূপ বলে স্বীকার করা হয়েছে। এমতে দেহ উৎপত্তি বিনাশযোগ্য হওয়ায় দেহ অনিত্য। কিন্তু দেহের উৎপত্তি বিনাশ ঘটলেও দেহমধ্যস্থ আত্মার উৎপত্তি, বিনাশ অসম্ভব। এখানে আত্মাকে উৎপত্তি, বিনাশ রহিত নিত্য, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় সত্তা বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং এই মতের উপর ভিত্তি করে নীতিতত্ত্বের আলোচনায় জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ আলোচিত হয়েছে। কর্মবাদ অনুসারে সম্পাদিত কর্মের ফলভোগ বিহীন যেহেতু জীবের মুক্তি হয় না, সেহেতু সঞ্চিত কর্মের ফল ভোগের জন্য জীব, জন্ম-মৃত্যু-পুর্নজন্ম— এই ভবচক্রে আবর্তিত হয়। ফলত এই পর্যায় প্রশ্ন আসে— যদি আত্মার বিনাশ অসম্ভবই হয় তাহলে জন্ম-মৃত্যু কাকে বলে? ভারতীয় দর্শনানুসারে অদৃষ্টানুসারে কর্মফল ভোগের জন্য আত্মার দেহধারণ বা দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হলো জন্ম এবং দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলো মৃত্যু। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু সবই দেহকে কেন্দ্র করে আত্মাকে কেন্দ্র করে নয়। আত্মা জন্ম-মৃত্যু রহিত শাশ্বত সত্তা। এখন এমন কৌতুহল হতেই পারে, শাশ্বত সত্তা হিসাবে আত্মাকে স্বীকার করার কারণ কী? উত্তরে বলি, আত্মকে যদি দেহাতিরিক্ত নিত্য শাশ্বত সত্তা বলে স্বীকার না করি তাহলে 'কর্মফলবাদ' ব্যাখ্যা অসম্ভব হয়ে পরে। আর কর্মফলবাদকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিদ্বারা সম্পাদিত কর্মের ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত বিচার কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই নৈতিক আলোচনাতেও আত্মার অমরতা পূর্বস্বীকৃত সত্য বলে স্বীকার্য। অর্থাৎ নীতি তাত্ত্বিক আলোচনার যথার্থতা প্রতিপাদনেও আত্মার অমরতা স্বীকার একান্ত প্রয়োজন এবং আত্মার এই স্বরূপকেই অধিবিদ্যার আলোচনায় জীবের স্বরূপ বলে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু মায়ার প্রভাব বশত ব্যক্তি এই সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে দেহকেই 'আমি' বলে দাবী করে এবং দেহের জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে 'আমার জন্ম-মৃত্যু হয়' বলে মনে করে। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি যে ভ্রান্ত তা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এখানে মনসুর বিস্ময়ের সুরে বলেন—

'কে বলে মানুষ মরে আমি বুঝলাম না ব্যাপার!
ওরে মানুষ মরলে, বিচার হবে কার?
আমি বুঝলাম না ব্যাপার!'

অতএব এই কথা বলা যায়, ভারতীয় দর্শনের প্রাথমিক আলোচনায় যে প্রশ্নগুলির উত্তর মূলত অনুসন্ধান করা হয়েছে, যথা— জগৎ কী? জগতের সৃষ্টি কিভাবে? সৃষ্টির মূলে কী আছে? আমি কে? আমার স্বরূপ কী? জীবাত্মার দুঃখের মূল কারণ কী? কী উপায় তা থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব? ইত্যাদি এই সকল প্রশ্নের উল্লেখ আমরা বাউল গানেও পাই।

তাছাড়া উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রথাগত দর্শনচর্চার ন্যায় বাউল গানেও বেদ-উপনিষদ-গীতা প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্য স্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে; এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে সহজিয়া ও সুফি চিন্তা-চেতনা, যা বাউল তত্ত্বকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। কাজেই এই কথা বলা বোধয় অত্যুক্তি হবে না যে, যে বৈদিক সাহিত্যকে প্রথাগত দর্শনচর্চার ভিত্তি বলে স্বীকার করা হয়; সেই বৈদিক সাহিত্য মধ্যস্থ সিদ্ধান্ত সমূহকে বাউলগণ আপন যুক্তি, উপলব্ধির দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং তা থেকে তারা আপন তত্ত্বগত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আর এই সিদ্ধান্ত সমূহকে যদিও তারা সুরময়তার সাহায্যে গানের ভাষায় প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এই গানগুলি দর্শনগত মতের অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছু নয়। তাই বাউল গানে ব্যবহৃত রূপক, সুর, ছন্দ, অলঙ্কার সাহিত্যচর্চার বিষয় হলেও গানের ভাবার্থ বিচার কিন্তু সাহিত্যচর্চার বিষয় নয়। এই ভাবার্থ বিচার অবশ্যই দর্শনচর্চার বিষয়। তাছাড়া 'দর্শন' শব্দের অর্থ যদি হয়, জগৎ ও জীবনকেন্দ্রিক যথার্থ জ্ঞানের অনুসন্ধান, তাহলে বাউলগণ অবশ্যই দার্শনিক এবং বাউল গানগুলি মুখ্যত দর্শন। মূলত গানের ভাবার্থকে কেন্দ্র করেই বাউল মতকে দর্শন বলে দাবী করা হয়। তাই বাউল গানগুলি প্রকৃত কাব্য নয়; তা হলো বিশুদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ। এখন স্বভাবত এই প্রশ্ন আসে— তাহলে বাউল গানকে কাব্যস্তরের বিচার্য বিষয় বলে মনে করার কারণ কী?

উক্ত প্রশ্নের একটা সম্ভাব্য উত্তর স্বরূপ এটা বলা যায়; যদিও বাউল গানগুলি মুখ্যত দর্শনগত তত্ত্ব এবং বাউলগণ দার্শনিক, তবুও বাউল গানকে কাব্যস্তরে অর্ন্তভুক্তি করা হয় তার ভাবের জন্য। বাউল গানের ভাষাকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে এটা স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি হয় যে, বিভিন্ন দর্শনগত সিদ্ধান্তকে ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে এখানে সুন্দর সুন্দর আধিবিদ্যক উপমা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই উপমাগুলি সাহিত্যগতভাবে অনেক উৎকর্ষ। তবে এই উৎকর্ষতার জন্য নয়, বাউল বাউল গানের মধ্যে যে ভাবের প্রকাশ ঘটেছে, তা সাধকের মনে আনন্দ সঞ্চার করে, যা বাউলের কাব্যিকতার প্রাণ। বাউল গানের এই বৈশিষ্ট্যই তাকে 'চর্যাপদ' থেকে ভিন্ন করেছে। বাউল গানের ন্যায় সহজিয়া বৌদ্ধ সাধক রচিত চর্যাপদেও আমরা অবিমিশ্র শুদ্ধ দর্শনগত সিদ্ধান্তের প্রকাশ খুঁজে পাই। কিন্তু বাউল গানে দর্শনগত সিদ্ধান্ত প্রকাশে যে সহজ সুর অবলম্বন করা হয়েছে, তা চর্যাপদে অনুপস্থিত। এখানে বিশুদ্ধ দর্শনগত সিদ্ধান্তকে প্রকাশে ছন্দ, উপমা, অলঙ্কারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সহজ সুরকে নয়। ফলত 'চর্যাপদ'-পাঠে সত্যতত্ত্বের নির্দেশ পাওয়া গেলেও তাতে প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয় না; যেটা হয় বাউল গানে। আর তাই বাউল সংগীত শুদ্ধ দর্শনগত সিদ্ধান্ত হওয়া সত্বেও কাব্য বলে বিবেচিত হয়।

এখন এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, বাউলের কাব্যত্ব অনুসন্ধানে কেন আনন্দময়তার প্রতি এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কাব্যত্বের আলোচনায় 'আনন্দ'-এর তাৎপর্য কী? উত্তরে বলি সাহিত্যগত পর্যালোচনায় 'আনন্দময়তা'কেই সাহিত্যের প্রাথমিক সংজ্ঞা বলে স্বীকার করা হয়[৫]। সাহিত্য অনুসারে জগৎ ও জীবনকেন্দ্রিক উপলব্ধ সত্য প্রকাশে যখন আনন্দের সৃষ্টি হয় তখন তা থেকে জন্ম হয় সাহিত্যের। সাহিত্যিকগণ আপন ভাষিক অভিব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্যে এক ধরণের আনন্দের সঞ্চার করে এবং এই আনন্দ মানুষে মানুষে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে। তাই বলা যায় সাহিত্যের মূলে আছে আনন্দ। এখন আবারও এই প্রশ্ন আসতে পারে, যেখানে একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে ভিন্ন সেখানে 'আনন্দ' কিভাবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে?

উত্তরে বলি, হ্যাঁ, এই কথা ঠিক যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নানা ভিন্নতা আছে। তাই জগতে আমরা এত বৈচিত্র্য খুঁজে পাই। কিন্তু এই ভেদ বা বিচিত্রতা কেবলই বাহ্য জগত বা বস্তুকে কেন্দ্র করে। অন্তর জগতের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোনো ভেদ নেই। এখানে ভেদভাব লোপ পায় এবং ঐক্যভাব প্রকাশ পায়। আসলে আত্মগত দিক দিয়ে সকলেই এক, ভেদরোহিত এবং পূর্ণতাবোধের অধিকারী। কিন্তু মায়ার প্রভাবে অজ্ঞতা বশত ব্যক্তি সাময়িকভাবে তা সম্বন্ধে বিস্মৃত হয় এবং নিজেকে অপরের থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। এই পর্যায়ে সে বাহ্য বিষয়ে আনন্দের অনুসন্ধান

করে। এই পর্যায় বাহ্যবিষয় কেন্দ্রিক যে আনন্দ বা সুখানুভূতি ব্যক্তির হয় তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। কিন্তু কাব্যের মধ্যে দিয়ে যখন পূর্ণতা বোধ প্রকাশ পায় তখন ব্যক্তির মধ্যে অজ্ঞতার প্রভাব দূরিভূত হয় এবং এই পর্যায়ে সে যে আনন্দ উপলব্ধি করে তাতে ব্যক্তিগত ভেদ থাকেনা। কাজেই এই কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, যেহেতু সাহিত্যের উৎসে আনন্দ, প্রকাশে আনন্দ এবং পরিনতিতেও অনিবার্যভাবে আনন্দের উৎপত্তি হয়, সেহেতু কাব্য-সাহিত্যের প্রাথমিক এবং আবশ্যিক উপাদান হলো আনন্দময়তা। আর বাউল গান যেহেতু শ্রোতার মনে আনন্দের সঞ্চার করে সেহেতু বাউল গানও সাহিত্য বলে বিবেচ্য।

অতএব এটা স্পষ্ট যে, আলোচ্য বিষয় বা অনুসন্ধানের বিষয়ের দিক থেকে যদিও সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য আছে কিন্তু প্রকাশের দিক থেকে সাহিত্য ও দর্শন কখনোই সমগত্রীয় চর্চা নয়। প্রকাশের দিক থেকে সাহিত্য ও দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী দুটি চর্চা। 'কাব্যের মধ্যদিয়ে সত্যস্বরূপের প্রকাশ ঘটে কিন্তু দর্শনে যা প্রকাশ পায় তাহল সত্যস্বরূপকে ভিত্তি করে গৃহীত সিদ্ধান্ত'[৬]। তাছাড়া কাব্যের প্রকাশ ভঙ্গি হলো ভাবস্বরূপের নির্দেশ, অপরদিকে দর্শনগত তত্ত্বের মধ্যদিয়ে ভাবস্বরূপ-নিরূপিত ভাব প্রক্রিয়ার নির্দেশ প্রকাশ পায়। বা বলা যায়, যেখানে কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য তার স্বরূপ প্রকাশকে কেন্দ্র করে, সেখানে দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো সামগ্রিক দৃষ্টিতে স্বরূপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অতএব দর্শন ও সাহিত্য কখনোই সমজাতীয় চর্চা নয়। দর্শনচর্চার সাথে সাহিত্যচর্চার ভিন্নতার আরেকটি প্রধান মানদণ্ড হলো 'অভিব্যক্তি'। অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে দর্শনচর্চা সাহিত্যচর্চা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাহিত্য ও দর্শন উভয়ের তাত্ত্বিক আলোচনায় 'সত্য' অনুসন্ধান করা হলেও সত্যের উপলব্ধিতে উভয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দর্শনে বিশ্ব সৃষ্টির মূলে এক শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তীতাকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিপরীতক্রমে সাহিত্য, কাব্যের ভাষায় জগৎ হলো সুন্দর। তাছাড়া যদিও কবি ও দার্শনিকগণ উভয়ই সর্বদর্শী, তত্ত্বার্থজ্ঞ, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার প্রকাশে উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা আছে। এই প্রসঙ্গে সোমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত হলো— 'তিনি আপন বোধ থেকে সৃষ্টি করেন সিদ্ধান্তের, তত্ত্বের। অতত্ত্বার্থের সমালোচনা করেন। অর্থাৎ তিনি সিদ্ধান্তের স্রষ্টা। দার্শনিক সর্ব বিষয়ের উপলব্ধি করে অ-সর্ববিষয়ের নিরসনের দ্বারা সর্ববিষয়ে নিশ্চয় করেন। তাই দর্শনে সর্ববিষয়ের নিশ্চয় হয়; কবির কাব্যে শুধু সর্ববিষয়ের প্রকাশ ঘটে'[৭]। আসলে এখানে তিনি মূলত এটাই বলতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তি যখন জাগতিক বিষয়কে অনুসন্ধান করেন, তার অন্তর্নিহিত সত্যের অনুসন্ধান করেন; তখন জগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের মধ্যদিয়ে যে ভাবের উৎপত্তি হয় কবি তাকেই সাহিত্যের ভাষায় অভিব্যক্ত করে থাকেন। পক্ষান্তরে দার্শনিকগণ উপলব্ধ ভাবকে প্রকাশ করার পরিবর্তে পূর্বে অ-ভাবের সঙ্গে তার তুল্যমূল্য বিচার করে তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই সাহিত্যের স্বরূপে কেবল ভাবের প্রকাশ ঘটলেও তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত সৃষ্টিতেই দর্শনের স্বরূপ প্রকাশ পায়। আর এখানেই একজন সাহিত্যিকের সাথে একজন দার্শনিকের মূল পার্থক্য। এখন প্রশ্ন—সাহিত্য ও দর্শনচর্চার মধ্যে এতটা পার্থক্য থাকা সত্বেও বাউল তত্ত্বালোচনায় সাহিত্যের সাথে দর্শনের সম্বন্বয় ঘটে কিভাবে?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ এটা বলা যায়, বাউল গানে যে সাহিত্যের সাথে দর্শনের সমন্বয় ঘটেছে তার মূলে আছে বাউল গানে ব্যবহৃত অধিবিদ্যক রূপক এবং এই রূপকের বর্ণনায় গৃহীত সুরময়তা। মূলত সুরময়তার কারণেই বাউল গানগুলি শুদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্ত হওয়া সত্বেও কাব্য হিসাবে বিবেচ্য। তবে কেবল সুরময়তা নয়, এক্ষেত্রে বাউলের জীবন দর্শন ও ভাবের গুরুত্বও অবশ্য স্বীকার্য। বাউলগণ তাদের জীবনচর্চার মধ্যদিয়ে যে সত্য উপলব্ধি করেন, গানের ভাষায় রূপকের আড়ালে তাকেই সে ব্যক্ত করেন। তার এই অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে সে কখনোই যেহেতু প্রত্যক্ষের গণ্ডী অতিক্রম করেনা, সেহেতু দর্শনগত তত্ত্বালোচনায় বাউলগণ স্বীকৃত সিদ্ধান্ত সমূহ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতিরিক্ত বিষয় নয়; বা প্রত্যক্ষ বর্হিভূত বিষয় বাউলিয়াতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয়। আসলে যেটুকু নিজের কাছে একান্ত স্পষ্ট ও বিবিক্ত এবং বিন্দুমাত্র সংশয়হীনভাবে বাউলগণ সাধনার মাধ্যমে যে সত্য উপলব্ধি করতে পারে; উপলব্ধ সেই অভ্রান্ত সত্যকেই সে সিদ্ধান্ত আকারে সুরের সাহায্যে গানের ভাষায় প্রকাশ করে। আর এই প্রকাশের ক্ষেত্রে যে ভাবকে সে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে, সেই ভাবই বাউল গানে, দর্শনের সাথে সাহিত্যের সমন্বয় সাধন করে। তাই বাউল গানে বর্ণিত কাব্যত্ব ও দর্শনের সমন্বয়কে বুঝতে হলে বাউলের কাব্যত্ব ভাবকে আগে জানতে হয়। ফলত এখন প্রশ্ন আসে—বাউল কাব্য কি ধরণের কাব্য?

বাউল গানগুলি সান্ধ্যভাষায় রচিত হওয়ায় বাউল কাব্যকে সান্ধ্যকাব্য বলে এবং এর ভিত্তি হিসাবে 'অধিদৈব ভাব'কে স্বীকার করা হয়। এখন পুনরায় এই প্রশ্নটি আসে—সান্ধ্যকাব্য কী? অধিদৈব ভাব কাকে বলে? বাউলকাব্যের ভিত্তি হিসাবে অধিদৈব ভাবকে স্বীকার করার কারণ কী? উত্তরে বলি, মূলত ভাবের দ্বারা কাব্যকে অকাব্য থেকে ভিন্ন করা হয়। তবে কেবল অকাব্য থেকে নয়, ভাবের বিচিত্রতার উপর ভিত্তি করেই কাব্যেরও বিচিত্রতা স্বীকার করা হয়। তাই কাব্য সাহিত্যের আলোচনায় 'ভাব' অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এখন প্রশ্ন— ভাব বলতে ঠিক কী বোঝায়? জগৎ ও জীবনকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে বোধ বা উপলব্ধি জন্মে তাকে ভাব বলে। এই ভাব মূলত দুই প্রকার যথা—

১. জ্ঞানময় অবস্থায় ব্যক্তি ভাব।
২. অজ্ঞানময় অবস্থায় ব্যক্তি ভাব।

মায়া মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি যখন আপন স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্মৃত হয় এবং অহং বুদ্ধির প্রভাবে কর্মে 'আমিত্ব' আরোপ করে তখন এই পর্যায় ব্যক্তি মনে যে ভাব বা বোধের জন্ম হয় তাকে 'অজ্ঞানময় ব্যক্তিভাব' বলে। এই পর্যায় ব্যক্তি জাগতিক কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। অপরদিকে মায়ারূপ অজ্ঞানের বিনাশের মধ্যদিয়ে ব্যক্তির মধ্যে যখন জ্ঞানের উদ্ভব হয়, যখন সে এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, এতদিন সে অনিত্যকে নিত্য বলে, অসহজকে সহজ বলে এবং জগৎকে পরমসত্য বলে ভেবে এসেছে—তখন ব্যক্তি মধ্যে যে বোধের উদ্ভব হয়, তাকে 'জ্ঞানময় ব্যক্তিভাব' বলা হয়। এই স্তরে ব্যক্তি যদিও সম্পূর্ণভাবে কর্মের বন্ধন ছিন্ন করতে পারেনা ঠিকই, কিন্তু অহংবুদ্ধির বশীভূত জাগতিক কর্মে 'আমিত্ব' আরোপ করা থেকে সে বিরত থাকে। আসলে এই স্তরে এসে সে ধীরে ধীরে 'স্বরূপ' অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। ফলত এই স্তরে ব্যক্তির মধ্যে যে ভাবের উদয় হয় তা পর্যায় ক্রমে তিনটি স্তরে বিভক্ত, যথা—

১. সংসারসম্বন্ধ ভাব।
২. আত্মসম্বন্ধ ভাব।
৩. অধিদৈব ভাব।

জ্ঞানময় অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে যে ভাবের উদয় হয় তন্মধ্যে প্রাথমিক স্তর হলো 'সংসারসম্বন্ধ ভাব'। পূর্বেই একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, জ্ঞানময় অবস্থায় ব্যক্তির মনে জগৎ ও বিষয়কে কেন্দ্র করে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়। ফলে এই পর্যায় ব্যক্তির সঙ্গে সংসারের বন্ধন শিথিল হয়, বা সংসারের প্রতি ব্যক্তির যে আসক্তি তা ছিন্ন হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, এই পর্যায় ব্যক্তি সংসারের প্রতি উদাসিন হয়ে পরে। এই পর্যায় ব্যক্তি সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়েও সচেতন থাকে। ফলে এই পর্যায় ব্যক্তি মনে যে ভাব জন্মে তাকে 'সংসারসম্বন্ধ ভাব' বলে। সংসারসম্বন্ধ ভাবের প্রভাবে ব্যক্তি জগৎকে উপেক্ষা না করলেও জগৎ, জীবন, সংসারের প্রতি তার যে দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে পরিবর্তন আসে। কিন্তু এর পরবর্তী পর্যায়তে সে সংসার, জগৎকে উপেক্ষা করে শুদ্ধ আত্মার ধ্যানে নিজেকে নিবেশ করে। উল্লেখ্য এখানে 'অস্বীকার' অর্থে 'উপেক্ষা' শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়নি। বরং 'উদাসীন' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে এখানে 'উপেক্ষা' শব্দের ব্যবহার। এই স্তরে ব্যক্তির মনে যে বোধের উদ্ভব হয় তাকে 'আত্মসম্বন্ধভাব' বলে। এর পরবর্তী পর্যায় ব্যক্তিমনে যে ভাবের উদ্ভব হয় তাই হলো 'অধিদৈব ভাব'। মনের এই স্তর 'আত্মসম্বন্ধ ভাব'-এর স্তর থেকে উচ্চ কারণ, 'অধিদৈব ভাব'-এর স্তরে উপনীত হয়ে ব্যক্তি কেবল শুদ্ধ আত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট থাকেনা। বরং এই পর্যায় ব্যক্তি আত্মার শুদ্ধ স্বরূপকে ভিত্তি করে জগত সংসারের অনিত্যতাকে প্রমাণ করে থাকে। এই স্তরে ব্যক্তির ধ্যানের বিষয় কেবলই 'স্বরূপ অনুসন্ধান'। তাই জ্ঞানময় অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে যে ভাবের উদ্ভব হয় তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব যে অধিদৈব্য ভাব, সেকথা বলাই বাহুল্য। অতএব এটা বলা যায়, যে ভাবকে সাহিত্যের প্রাথমিক উপাদান বলে স্বীকার করা হয়, সেই ভাবের মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য আছে। আর কাব্যের মধ্যে যেহেতু ভাবেরই প্রকাশ ঘটে, সেহেতু কাব্যের মধ্যেও যে ভিন্নতা আছে একথা অবশ্য স্বীকার্য। অজ্ঞানময় অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে যে ভাবের উদ্ভব হয়, সেই ভাবকে আশ্রয় করে সৃষ্ট সাহিত্য হলো 'বাস্তব সাহিত্য'। এরূপ সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় কখনই আত্মস্বরূপ নয় বরং জাগতিক বিষয় সমূহ এখানে মূল আলোচ্য বিষয়। তাই বাউল মতবাদ যে এরূপ কাব্য-সাহিত্য নয় তা সহজেই স্বীকার্য। বাউল কাব্য-সাহিত্য জ্ঞানময় অবস্থায় অধিদৈব্য ভাব অবলম্বনে রচিত সাহিত্য; কারণ, এর মুখ্য

আলোচ্য বিষয় 'জীবাত্মার স্বরূপ' আলোচনা। এখন এই প্রশ্ন আসতেই পারে যে, আত্মস্বরূপের ধ্যানে যে বোধের উৎপত্তি হয় তাকে তো 'আত্মসম্বন্ধ ভাব' বলে। তাহলে বাউল সাহিত্য কেন 'আত্মসম্বন্ধ ভাব' অবলম্বনে রচিত নয়? কেন তার ভিত্তি হিসাবে 'অধিদৈব ভাব'কে স্বীকার করা হয়? উত্তরে বলি, আত্মসম্বন্ধ ভাবকে ভিত্তি করে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাতে শুদ্ধ আত্মার ধ্যান, আত্মার মুক্তির কথা বলা হলেও সেখানে আত্মার স্বরূপ বোধক কোনো সিদ্ধান্তের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়না। এরূপ সাহিত্যে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক যে উপদেশ প্রকাশ পায় তা যেহেতু আধ্যাত্মিক উপদেশ তাই আত্মসম্বন্ধ ভাব অবলম্বনে রচিত সাহিত্য 'আধ্যাত্মিক সাহিত্য'। বিপরীতক্রমে অধিদৈব ভাব অবলম্বনে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাতে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। এখানে ব্যক্তির মধ্যে থাকা মায়া, মোহ, নিত্য-অনিত্যের ধারণার পর্যালোচনা করা হয়। যা আদতে দার্শনিক প্রবণতা। তাই অধিদৈব কাব্য প্রকৃত কাব্যিক প্রকাশ নয়, তা হলো দর্শনগত মতের প্রকাশ। আর বাউল তত্ত্বে বা গানে যেহেতু দর্শনগত সিদ্ধান্তের প্রকাশ ঘটে, সেহেতু বাউল কাব্য অধিদৈব কাব্য। এই কাব্য রচনায় মোহ মুক্ত, কর্মবন্ধন ছিন্ন, অহংবুদ্ধি ত্যাগী, সংসারের প্রতি আসক্তিহীন দৃষ্টির পরিচয় মেলে। যার জন্য সোমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে 'বাউল গানগুলি ব্রাহ্মীস্থিতি অবস্থায় রচিত গান'[৮]। বাউল কাব্যকে অধিদৈব কাব্য বলে মনে করার অপর কারণ হলো এর মধ্যে থাকা নেতীমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। আত্মসম্বন্ধ ভাব অবলম্বনে রচিত আধ্যাত্মিক কাব্যের মধ্যে শুদ্ধ আত্মার ধ্যান থাকলেও অ-স্বরূপের বর্ণনা সেখানে নেই। কিন্তু বাউল গানে কেবল স্বরূপের বর্ণনা করা হয়না। এখানে স্বরূপ জ্ঞানের ভিত্তিতে অ-স্বরূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। সত্যের আলোচনার সাথে অসত্যের সমালোচনা আছে। তাই বাউল কাব্য অধিদৈবভাব অবলম্বনে রচিত সাহিত্য।

এখন এই অংশের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বাউল ভাবনা প্রাক্ নির্বাণ পর্বে দাঁড়িয়ে অনাগত ও অনধিগতের ধারণা, ভাবনা। তাই এই কাব্য প্রকৃত কাব্য নয়, তা আদতে শুদ্ধ দর্শনগত সিদ্ধান্তের প্রকাশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তগুলিকে প্রকাশে যেহেতু বাউলগণ অন্তর থেকে নির্গত সহজ সুরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সেহেতু মূলত দর্শন হয়েও দর্শনের সীমাকে অতিক্রম ক'রে এই গানগুলি কাব্য স্তরের বিচার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্যভাবে বললে, যখন বাউল সংগীতে ব্যবহৃত ভাষা, ছন্দ, রূপক, অলঙ্কার, ইত্যাদি চর্চার বিষয় হয়, তখন তখন 'বাউল সংগীত'-এর চর্চা বলতে সাহিত্যমূলক চর্চাকে বোঝায়। কিন্তু যখন বাউল সংগীতে ব্যবহৃত আধিবিদ্যক রূপকের মর্মার্থ অনুধাবনের মধ্যদিয়ে গানের ভাষায় ব্যক্ত সিদ্ধান্ত বিচার্য বিষয় বলে গৃহীত হয়, তখন 'বাউল সংগীত'-চর্চা দর্শনগত চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। তাই প্রাথমিকভাবে বাউল তত্ত্ব ও গান সাহিত্যচর্চার বিষয় হিসাবে বিবেচ্য হলেও প্রকৃত অর্থে তা সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। সাহিত্যের গণ্ডীকে অতিক্রম করে দর্শনগত গবেষণাতেও বাউল তত্ত্ব ও গান সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। 'আত্মপরিচয়' ব্যাখ্যার্থে বাউল দর্শন স্বীকৃত লৌকিক অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কবিগুরুকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হলো 'জীবনদেবতাতত্ত্ব'। আত্মদর্শন প্রসঙ্গে গুরুদেবের দর্শনগত অভিমত মূলত প্রকাশ পেয়েছে দুটি তত্ত্বের মধ্যদিয়ে যথা— (১) প্রেমতত্ত্ব এবং (২) জীবনদেবতাতত্ত্ব। এর মধ্যে 'প্রেমতত্ত্ব'-এর ধারণাটি 'প্লেটোনিক প্রেমতত্ত্ব'-এর ধারণা পুষ্ট। তাই কারো কারো মতে পাশ্চাত্যের শেলীর ন্যায় প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ হলেন—স্বভাব প্লেটো। আর 'জীবনদেবতাতত্ত্ব'-এর ধারণার মধ্যদিয়ে বাউলের 'মনের মানুষ'-এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ের আলোচনায় এটা লক্ষ্য করা যায়—রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে দুইটি ভাব বা সত্তাকে স্বীকার করেছেন। যার একটি হলো জীবভাব এবং অপরটি হলো বিশ্বভাব। জীবভাবে ব্যক্তি দেহভেদে স্বতন্ত্র, কিন্তু বিশ্বভাবে সে অপরের থেকে পৃথক নয় বরং প্রত্যেকটি মানব এক পূর্ণসত্তার এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক। অর্থাৎ স্বরূপ অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে আত্মপরিচয়ের যে খোঁজ এখানে করা হয়েছে; তাতে বাউলের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আপনার মধ্যেই 'আমি' আছে। তাকে উপলব্ধি করার জন্য বাহ্যিক আচরণের কোনো প্রয়োজন নেই। যা প্রয়োজন তা হলো, নিজ মধ্যে থাকা ঐশি শক্তির উন্মেষ। কাজেই রবীন্দ্রনাথের দর্শন চিন্তায় 'ব্যক্তি পরিচয়'-এর যে বর্ণনা আমরা পাই; তা যে আদতে বাউল বর্ণিত মনের মানুষের অনুসন্ধান এই কথা বলাই বাহুল্য।

অতএব আলোচনার এই পর্যায় এসে এ দাবী করা বোধয় অমূলক হবে না যে, বাউল সংগীত কোনো অবসরকালীন বিনোদনের মাধ্যম নয়। বরং তা হলো দর্শনগত তত্ত্বকে উপস্থাপন করার একটা মাধ্যম। তবে মূল ধারার দর্শনচর্চার সাথে এই ধারার দর্শনচর্চার কিছুটা পার্থক্য আছে। মূল ধারার দর্শনচর্চায় জীবের স্বরূপ ব্যাখ্যায় হয় অধ্যাত্মবাদী আর না হয় জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু লালন সাঁইজীর গানের ভাষায় আত্মজ্ঞানার্জনের যে পথের সন্ধান আমরা পাই তাতে জড়বাদ এবং অধ্যাত্মবাদের মধ্যে নির্মিত বিভেদের প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। এবং উদ্ভব ঘটেছে 'লৌকিক অধ্যাত্মবাদ'রূপ এক তৃতীয় স্বরের। আসলে লোকায়েত চার্বাক দর্শনে যেখানে 'চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ'কে 'আত্মা' বলে দাবী করা হয়েছে। কিংবা অধ্যাত্মবাদী দর্শনে যেখানে দেহকে অতিক্রম করে 'দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র' সত্তা স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভকে স্বরূপের মানদণ্ড হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে; সেখানে বস্তুবাদী বাউল দর্শনে 'দেহ'কে রূপ বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং রূপকে অবলম্বন করেই এখানে স্বরূপের সন্ধান করা হয়েছে। তাই এই দর্শন রূপ-স্বরূপ দর্শন বলে পরিচিত। আসলে বাউল মতে দেহকে অতিক্রম করে বা দেহকে বর্জন করে যেহেতু আত্মজ্ঞান লাভ কোনো ভাবেই সম্ভব নয়, তাই দেহ মধ্যেই মহাসুখের আস্বাদন সম্ভব। যার জন্য বাউল দর্শনে আত্মদর্শনের মানদণ্ড হিসাবে এককভাবে দেহ কিংবা আত্মাকে স্বীকার করার পরিবর্তে উভয়কেই স্বরূপের মানদণ্ড বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাউল গবেষক শক্তিনাথ ঝা মহাশয়ের অভিমত হলো—"দেহ-আত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, আত্মপর প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে দেহে দুটি সত্তার অস্তিত্ব বাউল অনুভব করে"[৯]। এবং এই বৈশিষ্ট্যটি বাউল দর্শনকে অন্য দর্শন থেকে পৃথক করেছে। অন্যভাবে বললে, বাউল গানের মর্মার্থ বিচারে এটা উপলব্ধি হয় যে; বাউল দর্শনের মূলে আছে বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ্ বর্ণিত ব্রহ্মবাদের ধারণা এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে সহজিয়া দর্শন বর্ণিত সহজ মানুষের ধারণা, কিংবা সুফি স্বীকৃত আশিকতত্ত্বের ধারণা। তাই সাঁইজী যখন তাঁর গানের পদে বলেন—'ও যার আপনার খবর আপনার হয় না। একবার আপনারে চিন্তে পারলে যাবে অচেনারে চেনা'; তখন তার মর্মার্থ উপনিষদ্ বর্ণিত 'আত্মনং বিদ্ধি' কিংবা সক্রেটিস কথিত 'knowthy self'-এর সঙ্গে অভিন্ন অর্থের বোধক হয়। তবে নির্দিষ্টভাবে এর কোনো একটিকে তিনি যেহেতু তাঁর দর্শনের ভিত্তি হিসাবে স্বীকার করেন নি, তাই বাউল মতের সাথে এই সকল মতবাদের সাদৃশ্য থাকলেও কোনো মতের অন্তরে বাউল মতবাদ হারিয়ে যায়নি। বরং সে তার স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণ করেছে। আসলে পুরনোকে অস্বীকার না করলে যেমন নতুনের স্বীকৃতি মেলেনা, তেমনি আবার পুরোনকে অঙ্গে ধারণ না করলেও নতুনের স্বীকৃতি মেলে না। তাই বাউল মতবাদ এই সকল মতবাদের দ্বারা সমৃদ্ধ হলেও একক কোনো মতের অন্তরে নিজেকে হাঁড়িয়ে ফেলেনি। বরং লৌকিক অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে সে তার স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণ করেছে। তাই বাউল সংগীত কোনো অবসরকালীন বিনোদনের মাধ্যম নয়। তা আদতে জগৎ ও জীবনকেন্দ্রিক গুহ্যতত্ত্বকে আধিবিদ্যক রূপকের আড়ালে সহজভাবে উপস্থাপনের একটি মাধ্যম। অর্থাৎ সান্ধ্যভাষা অবলম্বনে এই গানের চর্চা আদতে দর্শনগত তত্ত্বের চর্চা, তাই ভারতীয় দর্শনে তত্ত্বগত আলোচনায় বাউল ও তার সংগীতের অবদান অবশ্য স্বীকার্য।

সূত্রনির্দেশ:

১. গুপ্ত, জগদীশ্বর, (১২৯৩), (সম্পা.), *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা,* ভিক্টোরিয়া প্রেস, পৃ. ২২১।
২. চক্রবর্তী, সুধীর, (২০১৭), (সম্পা.), *বাংলা দেহতত্ত্বের গান,* পুস্তক বিপণি, পৃ. ২২৮।
৩. হারুন, শরীফ, (১৯৯৪), (সম্পা.), *বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান,* বাংলা একাডেমী, পৃ. ১১৭।
৪. মাননান, আবদেল, (২০০৯), (সম্পা.), *অখণ্ড লালন সঙ্গীত,* রোদেলা প্রকাশনী, পৃ. ১০।
৫. বন্দোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রনাথ, (১৯৬৪), *বাংলার বাউল: কাব্য ও দর্শন,* বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৪।
৬. *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৬।
৭. *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৬৭।
৮. *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৬।
৯. ঝা, শক্তিনাথ, (২০১০), *বস্তুবাদী বাউল,* দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৫৩১।